

তৃতীয় অধ্যায়

নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

১. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৫. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কার্টুন আঁকতে পারব।

পাঠ ১৯: সচেতন ব্যবহার

তোমাকে যদি একটা ছোট কাঠি দিয়ে একটা গাছের ডাল কাটতে বলা হয়— তুমি সারাদিন চেষ্টা করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড়জোর গাছের বাকল একটুখানি তুলতে পারবে— তার বেশি কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে যদি একটা ধারালো দা দেয়া হয়— কয়েক কোপ দিয়েই তুমি গাছের ডালটা কেটে ফেলতে পারবে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ছোট কাঠিটা যদি তুমি অসতর্কভাবে ব্যবহার কর তোমার হাতে পায়ে বড়জোর একটু খোচা লাগতে পারে— কিন্তু ধারালো দা অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে ভুল জায়গায় কোপ লেগে ভয়াবহ রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।

ছোট কাঠি থেকে ধারালো দায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করে অনেক বড় কাজ করা যাবে— কিন্তু অসচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। এটা সবসময় মনে রাখবে— জীবনের সবকিছুর বেলাতেও এটা সত্যি। সবচেয়ে বেশি সত্যি এটা তথ্য প্রযুক্তির বেলায়— প্রযুক্তির ক্ষমতা কত সেটা নিশ্চয়ই তুমি এখন অনুমান করতে শুরু করছো, তাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটাকে ভুল করে ব্যবহার করলে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।



সবার চোখের আড়ালে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে না



অপরিচিত মানুষকে নাম-পরিচয়-ছবি পাসওয়ার্ড দেবে না

কাজেই প্রথমেই আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে, আমরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করব— কিন্তু সেটি ব্যবহার করব খুব সচেতনভাবে যেন কখনো কোনো সমস্যা না হতে পারে। অনেকের কাছেই কম্পিউটারের মূল ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। এই ইন্টারনেটে পৃথিবীর সব কম্পিউটার যুক্ত আছে তাই কেউ যখন ঘরের ভেতরে বসে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন হঠাৎ করে পুরো পৃথিবীটা যেন তোমার ছোটো ঘরের ভেতর হাজির হয়। এই পৃথিবীতে যেরকম অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে— যেখানে তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে, ঠিক সেরকম অনেক ভয়ংকর

বিপজ্জনক জায়গা আছে— যেখান থেকে তোমার একশ হাত দূরে থাকতে হবে। ইন্টারনেটের বেলাতেও তোমাদের সাথে একই ব্যাপার ঘটে, তোমার চোখের সামনে অনেক চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে যেটা তুমি উপভোগ করবে আবার তার পাশাপাশি অনেক বিপজ্জনক ওয়েবসাইট রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই তোমার দেখা উচিত না।

শুধু যে ওয়েবসাইট তা নয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে তুমি যখন অন্যদের সাথে যোগাযোগ করো তখন হঠাৎ করে শুধু পরিচিত মানুষ নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সাথেও যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। না বুঝে কোনো অপরিচিত মানুষের সাথে সরল বিশ্বাসে যোগাযোগ করে তুমি যদি আবিষ্কার করো মানুষটি আসলে একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেটে হানা দিয়েছে? মানুষটিকে তুমি যদি তোমার নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর, ছবি দিয়ে বসে থাকো আর সেই মানুষটি যদি সেগুলো কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন তুমি কী করবে?

কাজেই কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রথম নিয়মটিই হচ্ছে কখনো অপরিচিত মানুষকে নিজের পরিচয়, নাম, ঠিকানা আর পাসওয়ার্ড দিতে হয় না।

ইন্টারনেটে অপরিচিত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করলে অনেক রকম বিপদ হতে পারে, যেহেতু কেউ দেখছে না, তাই তাদের কথাবার্তা অনেক সময় অসংযত হয়ে যেতে পারে, শালীনতা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সত্যিকার জীবনে আমি যদি অসংযত বা অশালীন ব্যাপার না দেখি তাহলে সাইবার জগতে কেনো সেটি দেখব?



ইন্টারনেটে অন্যের সাথে রূঢ়, অসংযত, অশালীন হবে না

সবকিছুতেই বয়সের একটা ব্যাপার আছে— তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ তোমার বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা বইগুলো পড়তে তোমার ভালো লাগে, বড়দের জন্য লেখা বইগুলো তত ভালো নাও লাগতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় সেটা পড়তে গিয়ে তার বিষয়বস্তুর কারণে তুমি রীতিমতো ধাক্কা খেতে পারো। সাইবার জগতে সেটা হতে পারে, হঠাৎ করে তোমার সামনে যদি এমন কিছু চলে আসে যেটা মোটেও তোমার বয়সের উপযোগী না, তুমি রীতিমতো ধাক্কা খেতে পারো—তোমার মনটাই বিধিয়ে যেতে পারে। কাজেই সতর্ক থাকা ভালো।

তোমরা যারা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করো তারা নিচের তিনটি নিয়ম মেনে চলবে, দেখবে কখনো কোনো সমস্যা হবে না।

- (১) ইন্টারনেট কখনো একা অন্যদের চোখের আড়ালে ব্যবহার করবে না, এমন জায়গায় বসে ব্যবহার করবে যেখানে সবাই তোমার কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখতে পায়।
- (২) ভুলেও কোনো অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম, পরিচয়, ছবি বা পাসওয়ার্ড দেবে না।
- (৩) ইন্টারনেট ব্যবহার করবে আনন্দের জন্য, কারো ক্ষতি করার জন্য নয়— তোমাকে হয়তো দেখছে না তবুও কখনো অসংযত হবে না, রূঢ় হবে না, অশালীন হবে না।

দলগত কাজ

- (১) কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ছাড়াও তোমার জীবনে ব্যবহার করা আর কী কী প্রযুক্তি সচেতনভাবে ব্যবহার করা উচিত তার একটা তালিকা করো।
- (২) ইন্টারনেট ব্যবহার করার তিনটি নিয়ম লিখে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি করো।



নতুন শিখলাম: সাইবার জগৎ, বিপজ্জনক ওয়েবসাইট, পাসওয়ার্ড।

পাঠ ২০-২২: আসক্তি

২০০৯ সালে চীন দেশে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, সম্পর্কে তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিক্রি করে দিয়েছে। সবমিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তারা তাদের তিন ছেলেমেয়েকে বিক্রি করেছে আনুমানিক ৯০০০ ডলারে। তোমরা যারা খবরের কাগজ পড় মাঝে মাঝে আমাদের দেশেও হয়তো এরকম খবর তোমাদের চোখে পড়েছে, যেখানে কোনো একজন অসহায় মা, নিজের সন্তানদের মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্য কাউকে তার নিজের সন্তানকে দিয়ে দিচ্ছে। আমরা যখন এরকম খবর পড়ি, তখন আমাদের মন খারাপ হয়। আমরা তখন স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে আমাদের দেশটি এমন একটি দেশ হবে যেখানে আর কখনো কোনো অসহায় মা'কে এরকম কিছু করতে হবে না।

চীন দেশের স্বামী-স্ত্রীর ঘটনা কিন্তু মোটেও সেরকম কোনো ঘটনা নয়— তারা তাদের বাচ্চাদের বিক্রি করেছে কম্পিউটার গেম খেলার জন্য। তাদের দুজনেরই এমএমও (Massively multiplayer online game) নামে এক ধরনের কম্পিউটার গেম খেলার জন্যে আসক্তি জন্মেছে, সেই আসক্তি এত তীব্র যে সেটি খেলার খরচ জোগাড় করার জন্যে তারা তাদের নিজের সন্তানদের বিক্রি করে দিয়েছে।



নিউজ মিডিয়াতে চীন দেশের এক দম্পতির সন্তান বিক্রি করে দেয়ার খবর

এটি খুবই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং যখন এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে জানানো হয় তখন এটা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করেছিল যে কম্পিউটার গেমের এমন আসক্তি হতে পারে। এ আসক্তির জন্য সাধারণ কাউজ্ঞান পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়। আমাদের সবারই এটা মনে রাখা দরকার। কোনো কিছু ভালোলাগা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আমাদের ভালো লাগে, আমরা ভালো লাগার কাজটি করার চেষ্টা করি, তাই আমাদের জীবন এত সুন্দর। কিন্তু আসক্তি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তার মাঝে ভালো কিছু নেই! কেউ যখন কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যায় তখন তার কাছে যুক্তি কাজ করে না। সে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সেই কাজটি করতে থাকে। মাদক হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ— যখন কেউ মাদকে আসক্ত হয়ে যায় তখন সে তার ভয়ংকর আকর্ষণ থেকে বের হতে পারে না। তার নিজের এবং আশপাশে যারা আছে তাদের সবার জীবন সে ধ্বংস করে দেয়।

কম্পিউটার গেমের আসক্তিও ঠিক সে ধরনের হতে পারে। তোমরা যারা কম্পিউটার গেম খেলেছ কিংবা যারা হয়তো ভবিষ্যতে কম্পিউটার গেম খেলবে তাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে— তোমরা যেন বিষয়টা উপভোগ করতে পারো কিন্তু কোনোভাবেই যেন আসক্ত না হয়ে পড়ো।



ছোট শিশুরা সহজেই কার্টুনে আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কোনো একটা বিষয়ে আসক্ত হয়েছি কি না সেটা কীভাবে বোঝা সম্ভব? কাজটি মোটেও কঠিন নয়— যখনই দেখবে কেউ একজন কোনো একটি কাজে মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলছে তখনই বুঝবে সে সেই কাজে আসক্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে টেলিভিশনে অনেক রকম কার্টুন দেখায়— তোমরা সবাই সেইসব কার্টুন দেখেছ, দেখে হয়তো হাসিতে কুটি কুটি হয়েছে। যখন টেলিভিশনের সামনে থেকে উঠে এসেছ সেই কার্টুনের কথা ভুলে অন্য

কোনো কাজে মন দিয়েছ। কিন্তু যদি এরকম হয় যে তুমি টেলিভিশন ছেড়ে উঠতে পারছো না কিংবা যখনই টেলিভিশনের সামনে আসো তখনই টেলিভিশনে কার্টুন দেখ এবং তোমার জন্য অন্যেরা টেলিভিশনে অন্য কিছু দেখতে পারে না তখনই তুমি বুঝবে যে তোমার আসক্তি জন্মাতে শুরু করেছে। তোমার তখনই সতর্ক হওয়া দরকার। অনেক বাসাতে বাবা—মায়েরা এই বিষয়টা ভালো করে বোঝেন না। তারা ছোট বাচ্চাদের শান্ত রাখার জন্যে কার্টুন চ্যানেল খুলে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে রেখে দেন। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে ছোট বাচ্চাটি কার্টুন ছাড়া আর কিছু বুঝতেই পারে না। তাকে টেলিভিশনের সামনে থেকে সরানো যায় না এবং এটি বাচ্চাটির মানসিক বিকাশে অনেক বড় সমস্যা হতে পারে।

শুধু যে কার্টুন চ্যানেল বা কম্পিউটার গেম আসক্তি হতে পারে তা নয়, কোনো এক ধরনের খাবারেও আসক্তি হতে পারে। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে ব্রিটেনের একটি মেয়ে পিৎজা ছাড়া আর কোনো কিছু খেতে পারে না। গত একত্রিশ বছর থেকে সে সকালের নাস্তায়, দুপুরের সাঞ্চ, রাতের ডিনার বা দুটো খাবারের মাঝখানে কিছু খেলেও সে শুধু পিৎজা খায়। সে যেহেতু আর কিছু খায় না, খেতে পারে না। তাই এটাও খুব বড় ধরনের আসক্তি।

কাজেই তোমাদের সবারই খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো কিছুতে তোমাদের আসক্তি জন্মে না যায়। যেহেতু একবার আসক্তি হয়ে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব কঠিন। তাই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোনো কিছুতেই কোনোভাবে আসক্ত না হওয়া।

দলগত কাজ

কম্পিউটার গেমের আসক্তির ভয়াবহতা নিয়ে একটি নাটক লিখে সবাই মিলে অভিনয় করো।

এক সময় আসক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হতো জুয়া খেলা বা মাদক ব্যবহার এরকম বিষয়ের জন্য। তোমরা শূনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে এখন অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারও আসক্তি হিসেবে ধরা শুরু হয়েছে। যারা খুব বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্যে IAD বা Internet Addiction Disorder নামে একটা নতুন নাম পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে।

আজকাল অনেকেই কমবেশি কম্পিউটার ব্যবহার করে। কাজেই, প্রথমেই বুঝতে হবে কোন ব্যবহারটা হচ্ছে প্রয়োজনে আর কোনটা হচ্ছে আসক্তিতে। একজন যখন তার মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবকে সময় না দিয়ে সেই সময়টাও কম্পিউটারের পেছনে দেয় তখন বুঝতে হবে তার কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে। যখন কম্পিউটারে আসক্তি হবে তখন দেখা যাবে তার কাজকর্মে ক্ষতি হচ্ছে, লেখাপড়ায় সমস্যা হচ্ছে। যখন আসক্তি আরও বেড়ে যাবে তখন দেখা যাবে মানুষটি ঠিকমতো না ঘুমিয়ে সেই সময়টা কম্পিউটারের পিছনে বসে আছে— তখন তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে শুরু করে। যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে সাধারণ মানুষের খুব ভালো ধারণা নেই তাই অনেক সময় বাবা-মায়েরা কম্পিউটারের আসক্তির ব্যাপারটা বুঝতে



আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব কিন্তু কম্পিউটার যেন আমাদের ব্যবহার করতে না পারে

পারেন না। কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, কম্পিউটার ব্যবহারেরও নয়, এটি সবাইকে বুঝতে হবে।

কম্পিউটার আসক্তির কুফল কী হতে পারে? কিছু কিছু বিষয় খুব স্পষ্ট। কম বয়সি ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠার জন্য মাঠে ঘাটে ছোটাছুটি করতে হয়, খেলতে হয়। যে সময়টা খেলার মাঠে ছোটাছুটি করে খেলার কথা, সেই সময়টাতে তারা যদি ঘরের কোণায় কম্পিউটারের সামনে মাথা গুজে বসে থাকে তাহলে সেটা তার জন্য মোটেই ভালো একটি ব্যাপার নয়। যারা সত্যিকারভাবে কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যায়, দেখা যায় তারা কম্পিউটারের বাইরে চিন্তাও করতে পারে না। তারা শুধু যে সেটা নিয়ে সময় কাটায় তা নয়, সেটার পেছনে নিজের কিংবা বাবা-মায়ের টাকাও খরচ করতে শুরু করে।

যেকোনো আসক্তির জন্য একটা কথা সত্যি, একবার কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন। কাজেই তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের সবারই জানতে হবে

কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র, তার ব্যবহার যেন হয় প্রয়োজনে— কখনোই যেন তাতে আসক্তি জন্মে না যায়।

কখনো যদি সত্যি সত্যি আসক্তি জন্মেই যায় তখন সেখান থেকে তাকে বের করে আনার জন্য সবারই একটা দায়িত্ব থাকে। সেজন্য যে মানুষটির কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে তাকে কম্পিউটারের বাইরের জগৎ থেকেও আনন্দ পাওয়া শিখিয়ে দিতে হবে— সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে খেলাধুলা। যার আসক্তি জন্মেছে তাকে সময় ঠিক করে নিতে হবে— দিনে কতক্ষণ সে কম্পিউটার ব্যবহার করবে। যেমন— এক ঘণ্টার বেশি নয়। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো একটি কাজ করে তাকে কম্পিউটার ব্যবহারের সেই সময়টুকু অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে— কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। আমরা সেটাকে— ব্যবহার করব, কিন্তু সেটা যেন কখনো আমাদের ব্যবহার না করে।

দলগত কাজ

কম্পিউটারে আসক্ত একটি ছেলে বা মেয়ে সারাদিন কীভাবে দিন কাটায়, সেটি নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প লেখো।

আজকাল তথ্য প্রযুক্তির জগতে নতুন এক ধরনের আসক্তি দেখা দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এরকম অনেক ধরনের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন— ফেসবুক, এল্ল, লিংকডইন, ইউটিউব ইত্যাদি। ফেসবুক ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

এত বিশাল সংখ্যক মানুষ যে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তার গুরুত্বটা নিশ্চয়ই খুব সহজে বোঝা যায়। মানুষের ভেতরে কোনো একটা তথ্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে এই নেটওয়ার্কগুলোর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সরকার জোর করে দেশটাকে শাসন করে এবং অনেক সময় এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ সংগঠিত হয় এবং রীতিমতো আন্দোলন শুরু করতে পারে। তোমরা শুনে অবাক হবে আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশের স্বৈরশাসক বা সামরিক শাসককে আন্দোলন করে সরিয়ে দেয়ার পিছনে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যখন অনেক মানুষের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চাই তখন মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষের কাছেই এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেয়া যায়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আজকাল মানুষজন একে অন্যের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখে। কমবয়সিরা তথ্য প্রযুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে বলে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো কমবয়সিদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যোগ দেয়া যায় না কিন্তু তারপরেও অনেক কমবয়সিরাও নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিয়ে দেয় এবং সেটা থামানোর খুব সহজ উপায় নেই। তোমরা হয়তো যুক্তি দিতে পারো কোনো একটা বিষয় যদি ভালো হয় তাহলে ছোটরা সেটাতে যোগ দিলে ক্ষতি কী? আমরা তো কমবয়সিদের খবরের কাগজ পড়তে নিষেধ করি না, টেলিভিশন দেখতে বাধা দিই না তাহলে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিতে আপত্তি করব কেন?

এর অবশ্যই কয়েকটা কারণ আছে, প্রথম কারণ হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনকে সামান্যসামান্য দেখতে পায় না তাই ছোটরা তাদের সাথে সামাজিকভাবে মিশছে তা অনেক সময় বোঝা যায় না। একটা মানুষ যখন শিশু থেকে বড় হয় তখন সব সময়েই সে তার নিজ বয়সিদের সাথে সময় কাটায় এবং সেটাই হচ্ছে সঠিক, তাই যদি কখনো দেখা যায় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক বড় মানুষদের সাথে ওঠাবসা করছে তখন সেটা কমবয়সি ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালো নাও হতে পারে।

শুধু ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড়দের জন্যে যেটা এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি। অনেক সময় দেখা গিয়েছে মানুষজন এই সামাজিক নেটওয়ার্কে বসে একজন আরেকজনের সাথে তথ্য বিনিময় করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো বিষয়টা এত সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষ সত্যিকার অর্থে কোনো কাজ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামাজিক নেটওয়ার্কে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত কিংবা অপরিচিত মানুষের সাথে কাটিয়ে দিতে পারে। বিষয়টা বড় সমস্যা হয়ে গেছে বলে অনেক জায়গাতে অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জোর করে কোনো কিছু ব্যবহার করতে না দেয়া এক ধরনের সমাধান হতে পারে কিন্তু সেটা ভালো সমাধান না। ভালো সমাধান হচ্ছে যখন কোনো মানুষ তার নিজের বিচার বিবেচনা বৃদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু পরিমিতভাবে করে। আসক্ত হয়ে লাগাম ছাড়াভাবে তা করে না।



সামাজিক নেটওয়ার্কের বন্ধু আর সত্যিকারের বন্ধুর মাঝে অনেক পার্থক্য।

সামাজিক নেটওয়ার্কে থেকে মানুষজনের অসামাজিক হয়ে যাবারও এক ধরনের আশঙ্কা থাকে। যারা একে অন্যের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্ক করে তারা অনেক সময় নিজেরা একে অন্যকে “বন্ধু” বলে বিবেচনা করে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনের কাছে তথ্য পাঠানোকেই বন্ধুত্ব বলে মনে করে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব আরো অনেক গভীর অনেক বেশি আন্তরিক, অনেক বেশি বাস্তব। কাজেই, তথ্য প্রযুক্তির বন্ধুত্বকে সত্যিকার বন্ধুত্ব মনে করে কেউ যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে তার জীবনের অনেক বড় কিছু থেকে বঞ্চিত হবে।

দলগত কাজ

ক্রাসের দুটি দলে ভাগ হয়ে তোমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দেয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।



নতুন শিখলাম: এমএমও, আসক্তি, Addiction, Disorder, IAD, স্বেচ্ছাসংগত, ফেসবুক, এক্স, লিংকডইন।

পাঠ ২৩: কপিরাইট

মানুষের জীবনযাপনে দুই ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। এর একটি আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যেটি স্পর্শ করা যায়, যেমন বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা, জামা কিংবা খাবার। এগুলো মানুষের জাগতিক, তবে শুধু এসবেই মানুষ তৃপ্ত থাকে না। তাকে তার মানবিক গুণকেও লালন করতে হয়। সে গান শোনে, কবিতা আবৃত্তি করে, গবেষণা করে, সৃষ্টিশীল কাজ করে, নতুন নতুন গণ্য ও সেবা দিয়ে মানুষের জীবনকে সহজ করে। এসব বুদ্ধিভিত্তিক কাজের মাধ্যমেও সম্পদ সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ। মানুষ স্বাভাবিকই তার সব ধরনের সম্পদকে আঁকড়ে রাখতে চায়, রক্ষা করতে চায়। বস্তুজগতের সম্পত্তিগুলো এমন যে, কেউ চাইলেই সেটি নিয়ে যেতে পারে না, বা আরেকটা একই রকমভাবে বানাতে পারে না। কোনো লোক ইচ্ছে করলে কি আগাদিনের দৈত্যকে দিয়ে তোমার বাড়িটা তুলে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। কারণ সেটি একদিকে সম্ভব নয় আবার অন্যদিকে আইনও সেটা করতে দেবে না। অথচ ধরো তুমি সুন্দর একটি গান লিখে সেটিতে সুর করলে। তারপর তোমার বন্ধুদের শোনালে। তখন তোমার বন্ধুদের একজন ইচ্ছে করলে সেটি অন্যদের কাছে নিজের গান বলে চালিয়ে দিতে পারে। আবার নিজের নামে দাবি না করলেও এমনকি তোমার অনুমতি ছাড়া সেটি সে বিভিন্ন স্থানে গাইতে পারে। তুমি একটা সুন্দর কবিতা লিখলে, সেটিও কেউ একজন তোমার অনুমতি ছাড়া কোথাও ছাপিয়ে দিতে পারে। এরকম যদি হয় তাহলে সেটি সমাজের জন্য সুন্দর হয় না। কারণ এর ফলে যারা সৃজনশীল কাজ করে তারা তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। এমনকি এর জন্য যদি তাদের কোনো আর্থিক লাভ হওয়ার কথা থাকে সেটাও হয় না। আমরা একটি গল্পের বইয়ের উদাহরণ থেকে এই ব্যাপারটি আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারব। একজন লেখক তার শ্রম, সময় এবং চিন্তা দিয়ে বইটি লিখেন। এরপর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেন। তিনি বাজার থেকে কাগজ কিনে, বইটি ছাপিয়ে, বাঁধাই করে, বিভিন্ন বিক্রেতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। স্বাভাবিকই এ কাজে তার যে খরচ হয় সেটি ধরে নিয়ে তিনি বইয়ের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি অংশ লেখক পান যাকে বলা হয় রয়্যালটি। এখন যদি কেউ লেখকের অজান্তে তার বই বের করে ফেলে তাহলে লেখক তার এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যেটি সৃজনশীল কর্মের যারা স্রষ্টা তাদের এই অধিকার অক্ষুণ্ণ বা বজায় রাখে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপি বা পুনরুৎপাদন, অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইনের বিধান রাখা হয়। যেহেতু এই আইন কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি তাই এটিকে কপিরাইট (Copyright) আইন বা সংক্ষেপে কপিরাইট বলে।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বই কপি করা বা নকল করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে। লেখকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ১৬৬২ সালে কপিরাইট আইন (Licensing of the Press Act 1662) পার্লামেন্টে পাস করে। এই আইনের আওতায় যারা তাদের বইয়ের অননুমোদিত কপি করা বন্ধ করতে চায় তারা তাদের বই রেজিস্ট্রেশন করে একটা লাইসেন্স নিত। বই দিয়ে সূচনা হলেও পরে দেখা যায় সৃজনশীল কর্মের অন্যান্য প্রকাশেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। তখন বিভিন্ন আবিষ্কার, ব্যবসার মার্কা ইত্যাদিও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ বা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের আওতায় চলে আসে। কম্পিউটার আবিষ্কারের পর দেখা গেল বই, ছবি বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন খুবই সহজ। আর ইন্টারনেটের আবিষ্কারের পর দেখা গেল তা সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কাজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন এবং বিতরণও এখন এই আইনের আওতায় চলে এসেছে। একই সঙ্গে কম্পিউটারের প্রোগ্রামও যেহেতু একটি সৃজনশীল

কর্মকাণ্ড, তাই এই আইনের আওতায় এর স্রষ্টা তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন। বর্তমানে যেসব দেশে এই আইন আছে সেসব দেশে সৃজনশীল কাজের কপিরাইট স্রষ্টার মৃত্যুর পরও বলবৎ থাকে। এটি কোনো কোনো দেশে এমনকি ১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত এটি লেখক, শিল্পী, নাট্যকারের মৃত্যুর পর ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বাংলাদেশের কপিরাইট আইনে (কপিরাইট আইন ২০০০) এর মেয়াদ ৬০ বছর। যখন কোনো সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনরুৎপাদন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় চোরাই (Pirated) কপি। যেহেতু কম্পিউটারের বিষয়গুলো সহজে কপি করা যায় তাই এগুলোর চোরাই কপি পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় আমাদের এই বিষয়টি সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কম্পিউটার থেকে কপি করে দেব তখন যেন কপিরাইট আইন ভঙ্গ না করি। শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা গেমস নয়, আমাদের কম্পিউটারে অনেক সময় অনেক ছবি থাকে, অনেকের গল্প-কবিতাও থাকে। আমরা যখন কাউকে সেটা কপি করে দেব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সেগুলো কপি করে অন্যকে দেওয়ার অধিকার নেই। তবে সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতাও থাকে। বিশেষ করে, একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করা যায়। পড়ালেখার কাজে আমরা কোনো বইয়ের যে ফটোকপি করি, তা কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে না। এরকম ব্যবহারকে বলা হয় ‘ফেয়ার ইউজ’।

কপিরাইটের এই সংরক্ষণবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি ভিন্নধর্মী ধারণাও বর্তমানে বেশ চালু হয়েছে। এর মূল কথা হলো কোনো লেখক, শিল্পী, প্রোগ্রামার বা নাট্যকার ইচ্ছে করলে তার সৃষ্ট সৃজনশীল কর্মকে শর্তসাপেক্ষে কপি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। এই দর্শনকে বলা হয় মুক্ত দর্শন বা ওপেন সোর্স ফিলসফি (Open Source Philosophy)। যারা এই দর্শনের অনুসারী তারা তাদের সৃজনশীল কর্মকে কয়েকটি লাইসেন্সের মাধ্যমে সবাইকে ব্যবহার করতে দেন। এর মধ্যে কপিরাইটের একেবারে উল্টোটি হলো কপিলেফট (Copyleft)। যার অর্থ সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টা সবাইকে এই কাজ কপি করার সানন্দ অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। কপিরাইট আর কপিলেফটের মাঝখানে রয়েছে সৃজনী সাধারণ বা ক্রিয়েটিভ কমন্স (Creative Commons)। সৃজনী সাধারণ লাইসেন্সের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মস্রষ্টার কিছু কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন—যে কেউ ইচ্ছে করলে লেখকের বই তার লিখিত বা কোনো আইনি অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করতে পারবে। তবে লেখকের নামে প্রকাশ করতে হবে বা সেটি দিয়ে কোনো মুনাফা লাভ করা যাবে না। মুক্ত দর্শনের আওতায় যে কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলোকে একত্রে মুক্ত সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software) বলা হয়। এই সফটওয়্যারগুলো সহজে একজন অন্যজনকে কপি করে দিতে পারে, ব্যবহারও করতে পারে। তবে যেহেতু সবাই কপি এবং পরিবর্তন করতে পারে তাই সারাবিশ্বের লোকেরা মিলে এই সফটওয়্যারগুলোকে খুবই শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলে। এই দর্শনের আর একটি বড় প্রকাশ হলো মুক্ত জ্ঞানভান্ডার উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org)। সবাই মিলে ইন্টারনেটে এই মুক্ত জ্ঞানকোষ গড়ে তুলেছে কয়েকটি মুক্ত লাইসেন্সের আওতায়।

দলগত কাজ

মুক্ত দর্শনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।



নতুন শিখলাম: কপিরাইট, কপিলেফট, ক্রিয়েটিভ কমন্স, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, Pirated, ফেয়ার ইউজ, মুক্ত দর্শন।

পাঠ ২৪-২৬: নৈতিকতা ও প্লেজারিজম

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে যে দোকানগুলো আছে সেগুলো বাইরে থেকে দেখি, প্রত্যেকটা দোকানের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি না দরজাটা খোলা আছে কি না। যদি দরজাটা খোলা থাকে আমরা অপরিচিত একজন মানুষের ঘরে ঢুকে যাই না। কেউ যদি ঢুকেও যায় সে দোকানের ভেতরের সব জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে চলে আসে না। সত্য মানুষ হিসেবে আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব থাকে। বরং যদি কখনো দেখা যায় কেউ তার দরজা ভুলে খুলে চলে গেছে, তাকে ডেকে এনে বন্ধ দরজাটা বন্ধ করে যেতে।

তথ্য প্রযুক্তি আসার পর হুবহু এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখি, সেখানে যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তার যে অংশটুকু সে আমাদের দেখাতে চাইছে আমরা সেই অংশটুকু দেখতে পাই। ওয়েবসাইটের নিজস্ব বা গোপন অংশটুকুতে আমাদের ঢোকার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। সেখানে যেতে পারে তাদের নির্দিষ্ট মানুষজন—যারা গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট তথ্য সাজিয়ে রাখে, বা কাজ করে। যাদের সেখানে যাবার অনুমতি নেই তারাও কিন্তু সেখানে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। পাসওয়ার্ড জানা না থাকলেও সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেক সময় কেউ ওয়েবসাইটের ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে ভেতরে ঢুকে সে কোনো কিছু স্পর্শ না করে বের হয়ে আসতে পারে—আবার কোনো কিছু পরিবর্তন করে বা নষ্ট করেও চলে আসতে পারে। যেহেতু এই কাজগুলো করা হয় নিজের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে এবং যেখানে অনুপ্রবেশ হয় যেটা হয়তো লক্ষ মাইল দূরের কোনো জায়গা—অদৃশ্য একটি সাইবার জগৎ, লোকচক্ষুর আড়ালে, তাই সেটা ধরার উপায়ও থাকে না। এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে হ্যাকিং এবং আজকাল নিয়মিতভাবে কম্পিউটারের ওয়েবসাইট হ্যাকিং হচ্ছে। কেউ যদি শুধু কৌতূহলী হয়ে অন্যের ওয়েবসাইটে ঢুকে কোনো ক্ষতি না করে বের হয়ে আসে তাকে বলে White hat hacker বা সাদা টুপি হ্যাকার আর যদি কোনো কিছু ক্ষতি করে আসে, নষ্ট করে বসে তখন তাকে বলে Black hat hacker বা কালো টুপি হ্যাকার। তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে সাইবার ওয়ার্ল্ডে এরকম অসংখ্য সাদা টুপি আর কালো টুপি হ্যাকার প্রতিমুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোতে বেআইনিভাবে ঢোকা ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে—নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তেই আগের থেকে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তারপরও হ্যাকাররা বসে নেই। ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৯ বছরের একটা ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নিরাপত্তা ভেদ করে তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করে ঢুকে গিয়েছিল।

বুঝতেই পারছ হ্যাকিং অনৈতিক কাজ। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করতে বা বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সবারই ইচ্ছে করে কিন্তু ওয়েবসাইটের হ্যাক করা সেরকম চ্যালেঞ্জ নয়। অনৈতিক চ্যালেঞ্জ নেয়ার কোনো কৃতিত্ব নেই। যাদের বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ নেবার ইচ্ছে করে তাদের জন্যে শত শত সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলোই নিতে পারে।

যখন এসএসসি, এইচএসসি বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় তখন ওয়েবসাইটে সেটা দিয়ে দেয়া হয়। তোমাদের অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছ প্রথম যখন সেটা প্রকাশিত হয়, আর সবাই একসাথে যখন সেটা দেখার চেষ্টা করে তখন অনেক সময়ই দেখা যায় ওয়েবসাইটটি কাজ করছে না। কেউ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না—সবকিছুর একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে, কাজেই ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে গেলে ওয়েবসাইট আর সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বাভাবিক

কারণেই সেটা হতে পারে। আবার অনেক সময় কেউ ইচ্ছে করে সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলতে পারে যেখানে একটা কম্পিউটারের একটা প্রোগ্রাম কৃত্রিমভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটে প্রতি সেকেন্ডে শত সহস্রবার প্রবেশ করতে পারে— তখন তার ধাক্কায় ওয়েবসাইটটি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই এটাও অনৈতিক কাজ, ইচ্ছে করে একটা ওয়েবসাইট অচল করে দেয়ার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই।

আজকাল অনেক পত্রপত্রিকাও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। অনেক পত্রপত্রিকাতেই একটা খবর বা কোনো একটা লেখার পিছনে পাঠকরা নিজেদের মন্তব্য লিখতে পারে। পাঠক ইচ্ছে করলেই অনেক সূচিস্থিতিভাবে একটা খাঁটি মন্তব্য লিখতে পারে— কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় একজন পাঠক শুধু শুধু যুক্তিহীন, অশালীন একটা কথা লিখে রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু করার নেই—কিন্তু সবাইকে জানতে হবে বিষয়টা অনৈতিক।



আজকাল দেশ-বিদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাই ইন্টারনেটে থাকে। অনেক জায়গায় পাঠকরা সরাসরি মন্তব্য লিখতে পারে।

ইন্টারনেটে যেহেতু মানুষের নিজের মত প্রকাশের বিশাল স্বাধীনতা রয়েছে— যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটা প্রকাশ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে সেটাকে অপব্যবহার করা হয়। ই—মেইলে অনেক সময় কাউকে আঘাত দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেয়া হয়। লুকিয়ে করা হয় বলে সেটা নিয়ে অনেক সময় কিছু করাও যায় না। কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একজনকে অসম্মান করার জন্যে তার সম্পর্কে মিথ্যা কিংবা অসম্মানজনক কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য মানুষের কাছে তথ্য পাঠানোর যে কাজটি আগে কঠিন ছিল এখন সেটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাজেই সেই কাজটি ভালোভাবে ব্যবহার না করে যখনই খারাপভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই বুঝতে হবে নৈতিকতা রক্ষা করা হয়নি।

দলগত কাজ

হ্যাকিং করে কোনো একটি ওয়েবসাইট নষ্ট করে দিলে সেই ক্ষতিটুকু কোথা থেকে শুরু করে কোথার পর্যন্ত যেতে পারে সেটি বের করো। তোমার বক্তব্যের পেছনে যুক্তি দেওয়ার জন্যে সম্ভাব্য হ্যাকিংয়ের একটা উদাহরণ দাও।

কখনো কখনো ইন্টারনেট বা তথ্য প্রযুক্তিতে শুধু যে অনৈতিক কাজ করা হয় তা কিন্তু নয়— সীমা অতিক্রম করে বেআইনি কাজও করার চেষ্টা করা হয়। ওয়েবসাইট হ্যাকিং করা শুধু যে অনৈতিক কাজ তা নয়, সেটা একই সাথে বেআইনি কাজ।

ইন্টারনেটে এরকম অনেক ধরনের মানুষ অনেক ধরনের অনৈতিক আর বেআইনি কাজ করে ফেলে।

আমাদের সেগুলো জানা থাকা ভালো। যেহেতু পুরো বিষয়টা হয় সাইবার জগতে, চোখের আড়ালে তাই প্রতারণার কাজটি হয় সবচেয়ে বেশি। যেমন হয়তো কারো সাথে যোগাযোগ করে বলা হলো যে সে লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছে। টাকাটা নিতে হলে অমুক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে। সরল বিশ্বাসে হয়তো সেই মানুষটি যোগাযোগ করে। তখন তাকে বোঝানো হয় কিছু টাকা দিলে বড় পুরস্কারটা পেয়ে যাবে। অনেক সময় মানুষটি—সেই টাকা দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। আবার কেউ হয়তো জানায় যে, তার হাতে অনেক টাকা চলে এসেছে এবং সে টাকাটা নিরাপদে রাখতে চায়— তখন অনেকে লোভে পড়ে সেই ফাঁদে পা দেয়। কাজেই সবার জানা থাকা ভালো অপরিচিত ই-মেইলের এরকম অবিশ্বাস্য লোভনীয় আশ্বাস নিঃসন্দেহে প্রতারণা।

ইন্টারনেটের বড় একটি অপরাধ হয় ক্রেডিট কার্ড নিয়ে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জেনে গেছ আজকাল কাগজের নোট দিয়ে টাকা-পয়সার লেনদেন খুব দ্রুত কমে আসছে। পৃথিবীর অনেকেই সোটি করে ক্রেডিট



কার্ড দিয়ে। ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হলে সেই কার্ডটিরও প্রয়োজন হয় না—শুধু নম্বরটি জানলেই চলে। কাজেই, মানুষের ক্রেডিট কার্ডের নম্বর জানার জন্য বড় বড় অপরাধীরা অনেক বড় বড় সাইবার অপরাধ করে। সাধারণত যখন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয় তখন নিরাপত্তার বিষয়টিতে অনেক

অনেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে প্রতারকরা এ রকম ই-মেইল পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা করে

গুরুত্ব দেয়া হয়— সেখান থেকে নম্বরটি বের করা কঠিন। কিন্তু প্রতারকরা মানুষকে প্রতারণা করে ধোঁকা দিয়ে নম্বরটি জেনে নেবার চেষ্টা করে এবং মানুষটি বোঝার আগে সেই নম্বরটি ব্যবহার করে বড় অঙ্কের টাকা তুলে নেয়।

আজকাল অপরাধীরাও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। তারা তাদের অবৈধ কাজের তথ্য ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে পাচার করে। সারা পৃথিবীতেই সেজন্য আইন পাস করা হচ্ছে। যাদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যায় না তাদেরকে এই বিশেষ আইন দিয়ে বিচার করতে হয়।

পৃথিবীতে অনেক বিভ্রান্ত মানুষ থাকে যারা ভুল বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। বাম বা ডান চরমপন্থী অনেক মানুষ বা দল আছে। তারা তাদের বিশ্বাসকে ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনও দেখা গেছে যে একটি সংগঠন হত্যা মানুষকে আরও হত্যা করিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তবে তোমাদের এসব নিয়ে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের জানতে হবে তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট কিংবা সাইবার জগৎ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে কিছু মানুষ হয়তো বড় ধরনের অন্যায্য অপরাধ করে ফেলতে পারে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা যদি একটুখানি সতর্ক থাকি তাহলেই এই অপরাধী মানুষের পেতে রাখা ফাঁদে আমরা কখনোই পা দেব না। আমরা শুধু সুন্দর আর আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারব।

কম্পিউটার ভাইরাসের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। অনেকে মজা করার জন্য হোক বা অপরাধ করার জন্যেই হোক, নানা ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করে সেটাকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। সেগুলো ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতরে কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে। ছোটখাটো যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সেগুলো অনেক বড় বড় সমস্যা ঘটাতে পারে। Mydoom Worm নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে একদিনে আড়াই লক্ষ কম্পিউটারকে আক্রান্ত করেছিল। ১৯৯৯ সালে Melissa নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস এত শক্তিশালীভাবে সাইবার জগৎকে আক্রমণ করেছিল যে, মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিকে তাদের ই-মেইল সার্ভারকে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



মেলিসা ভাইরাস তৈরি করার অপরাধে ডেভিড স্মিথ নামে এই মানুষটির দশ বছর জেল হয়েছিল

দলগত কাজ

কম্পিউটারে বেআইনি কাজ করে বিপদে পড়েছে এর উপর ভিত্তি করে একটা কার্টুন আঁকো।

প্রজারিজম :

নিজের লেখায় অন্যের লেখা কোনো কিছু ব্যবহার করতে হলে সবসময় সেটি পরিষ্কার করে বলে অন্যের অবদান স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. যার অন্তর্নিহিত মৌল সুর এক সুনির্দিষ্ট শিল্পদর্শ ও শিল্পতাত্ত্বিক পটভূমির উপর স্থাপিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চারমান নাট্যবৃত্ত ও তাত্ত্বিকবোধে আমরা লক্ষ করি তাঁর স্বদেশ ও শিল্পভাবনার পরিণতিশীল এক অভিযাত্রা।
২. ড. আহমেদ আমীনুল ইসলাম, স্বদেশ ও শিল্পতত্ত্বের পটভূমিকায় নাট্যকার সেলিম আল দীন, থিয়েটার স্টাডিজ, সেলিম আল দীন সংখ্যা, জুন ২০০৮, সংখ্যা-১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাতার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬১।
৩. সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন কর্তৃক রচিত ‘চাকা’ নাটকের প্রচ্ছদভূমিকা।
৪. ড. আফসার আহমদ, সেলিম আল দীনের শিল্পতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষা, থিয়েটার স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।
৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের উপকথা, রূপকথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য জাগে... ১৯৮৬ সালে ঢাকা থিয়েটার আয়োজিত ‘জাতীয় নাট্যমেলা’য় আমরা এদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সাধনের সংকল্প উচ্চারণ করি।

আমরা যখন লেখাপড়া করি তখন আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখি যা আগে জানতাম না- তার সাথে সাথে আমরা আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ হওয়া, খাঁটি মানুষ হওয়া। খাঁটি মানুষেরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহ্যও করে না। নিজেরা অন্যায় করে না, অন্যদেরকেও অন্যায় করতে দেয় না। আমরা সব সময় স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন লেখাপড়া করবে তখন অন্য অনেক নতুন জিনিস শেখার সাথে সাথে সত্যিকারের মানুষ হওয়াটাও শিখবে।

তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে দেখি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় দেখাদেখি করে। তোমরা কখনো কখনো দেখে থাকবে বড় কোনো পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্রছাত্রী নকল করতে গিরে ধরা পড়ছে, তাদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে- এই ছাত্রছাত্রীরা নির্বুদ্ধিতা করে নিজেদের ভবিষ্যটাকেই নষ্ট করে ফেলছে।

এরকম ব্যাপার পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়- তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই বিষয়গুলো হঠাৎ করে নতুন একটা মাত্রা পেয়েছে। লেখাপড়া করতে গেলেই হোমওয়ার্ক করতে হয়। হোমওয়ার্কগুলো সব সময়েই নিজে করতে হয়। অন্য কেউ হোমওয়ার্ক করে দিলে হয়তো ভালো নম্বর পাওয়া যায় কিন্তু শেখা তো হয় না। হোমওয়ার্ক নানা ধরনের হতে পারে-ছাত্রছাত্রীরা যতই বড় ক্লাসে যায় ততই তাদেরকে আরো বড় বড় হোমওয়ার্ক করতে হয়। বড় রচনা লিখতে হয়, বড় প্রজেক্ট লিখতে হয়। যারা সত্যিকারের ছাত্র তারা নিজেরা পড়াশোনা করে খাটখাটি করে গবেষণা করে সুন্দর সুন্দর রচনা লেখে। অনেক সময়েই কোনো কোনো শিক্ষার্থী সেই পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। যেহেতু ইন্টারনেটে পৃথিবীর প্রায় সব বিষয়েই কিছু না কিছু তথ্য আছে তাই তারা সেখান থেকে হুবহু বিষয়টা নিয়ে নিজের নামে জমা দিয়ে দেয়। কিন্তু অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া বা প্রকাশ করাকেই প্রেজারিজম বা লেখাচুরি বলে।



প্রেজারিজমের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ফরিদ জাকারিয়াকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তোমরা সম্ভবত শব্দটা আগে শোননি, সত্যিকথা বলতে কী তোমরা যদি বড়দেরকে জিজ্ঞেস করো দেখবে তাদের অনেকেই এটা হয়তো আগে শোনেননি। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই শব্দটার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ এটা পৃথিবীতে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝে হোক না বুঝে হোক অনেকেই প্রেজারিজম করছে- এবং তাদের অনেকেই এজন্য খুব বড় বিপদে পড়ে যায়।

আমরা অবশ্যই অন্যের লেখা পড়ে শিখব এবং নিজেরা কিছু লেখার সময় অন্যের লেখার সাহায্য নেওয়াটাও অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিলে নিজের লেখায় সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বসে দিতে হয়। কোন অংশটুকু তুমি নিজে লিখেছ আর কোন অংশটা অন্যের লেখা থেকে নিয়েছ সেগুলো যদি খুব স্পষ্ট থাকে তাহলেই কোনো সমস্যা হয় না।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রেজারিজম যেমন বেড়েছে ঠিক সেরকম প্রেজারিজম ধরার কৌশলও অনেক বেড়েছে। তোমরা কি জানো কোনো মানুষ যদি ইন্টারনেটের কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু হুবহু টুকে নেয় সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাথে সাথে খুঁজে বের করা যায়?

অন্যায় করলে সেটা নিজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে-কিন্তু নিজের জন্য বিপজ্জনক সেজন্য নয়, তোমরা কখনোই কোনো অন্যায় করবে না। কারণ তোমরা বাংলাদেশের একেবারে খাঁটি মানুষ হয়ে বড় হবে এবং বড় হয়ে তোমরাই একদিন এই দেশের দায়িত্ব নেবে।

দলগত কাজ : ক্লাসের সবাই দুটি দলে ভাগ হয়ে প্রেজারিজম আর নিজের তৈরি করা কাজের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।



নতুন শিখলাম: হ্যাকিং, কালো টুপি হ্যাকার, সাদা টুপি হ্যাকার, ক্রেডিট কার্ড, Mydoom Worm, Melissa, প্রেজারিজম।

নমুনা প্রশ্ন

১. বাড়িতে কম্পিউটার রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কোনটি?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. বসার ঘর | খ. শোয়ার ঘর |
| গ. খাবার ঘর | ঘ. পড়ার ঘর |

২. সামাজিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে—

- ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ নাও হতে পারে
- আন্তরিকতার অভাব থাকে
- প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. কম্পিউটারে অসম্পূর্ণ একজন ব্যক্তি—

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ক. অসামাজিক হয়ে যেতে পারে | খ. কম্পিউটারে দক্ষ হতে পারে |
| গ. লেখাপড়ায় ভালো হতে পারে | ঘ. জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিমুর বয়স পাঁচ। ইদানীং ঘুম থেকে উঠেই সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখতে শুরু করে। এ সময় সে বাবা-মাকে বিরক্ত করে না বলে বাবা-মাও বেশ খুশি।

৪. রিমুর ক্ষেত্রে কার্টুন দেখাকে বলা যায়—

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ক. সময় কাটানো | খ. প্রয়োজন মেটানো |
| গ. কার্টুনের প্রতি আসক্তি | ঘ. আনন্দ উপভোগ করা |

৫. রিমুর প্রতি বাবা-মার আচরণে সে—

- অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে
- শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে
- সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |